বিক্ষিপ্ত সাম্প্রতিক সময়ের বিক্ষিপ্ত চর্চা

ব্রতীন চট্টোপাধ্যায়

এ সংসার রাজনীতিময়। ঘরে বাইরে, যুগ যুগ ধরে উচ্চ নীচ, শক্তিমান শক্তিহীনের মধ্যে রাজনীতির যে খেলা তা ক্ষমতা অর্জনের, সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করার। উচ্চের নীচের প্রতি এবং নীচের উচ্চের প্রতি সংলাপ এই রাজনীতির ভাষ্যেই ধরা পড়ে 'রাজনীতি' শব্দটার মধ্যে যে রাজার অনুজ্ঞা, তারই মধ্যে নিহিত উদ্দেশ্যটা— কর্তৃত্ব, অন্যের উপর ক্ষমতার অধিপত্য। ম্যাক্স ওয়েবার এই ক্ষমতার সম্বন্ধটা দেখতে চেয়েছেন সংগঠিত রাজনীতির প্রসঙ্গে। সংগঠিত রাজনীতির নিজস্ব ক্ষমতার দাবি আছে, তেমনি রয়েছে ব্যক্তিমানুষের ক্ষমতার দাবি। এই ব্যক্তিমানুষ, রাস্তার ঠেলাওয়ালা হতে পারে আবার কোম্পানির মালিকও হতে পারে। দু'জনেরই ক্ষমতার দাবি রয়েছে নিজের নিজের মতো করে আর তাই এই দুই জনের রাজনীতির প্রসঙ্গ আলদা।

আর সংগঠিত রাজনীতি? তারও দাবি আলাদা। কিন্তু সেই দাবির আওতার মধ্যে এসে পড়ে ওই দুইজনই। এই দু'জনের দাবিকে একসঙ্গে বা আলাদা করে সংগঠিত করতে যে রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠে, তা তার ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্নও নয়। এই ঐতিহাসিকতার মধ্যেই নিহিত সংগঠনের শক্তি এবং তার দুর্বলতাও। অতীতে যে উদ্দেশ তা নিয়ে সংগঠন গড়ে উঠেছিল তার বাস্তব পরিস্থিতি পালটে গেলে বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির পরেও সংগঠনের কাঠামো থেকেই যায়, থেকে যায় কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিমানুষ। যে ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে রাজনীতি সংগঠিত হয় তার পরিবর্তন হয়ে গেলেও সংগঠনের কাঠামোকে ভাঙা যায় না— উদ্দেশ্য বদলে যায় কিন্তু সেই একই সংগঠন পরিচিত স্থায়িত্ব পেতে চায়। সমাজের গতিশীলতা বারবার পথ ও গন্তব্যের বদল ঘটায় সুস্থিরতা পেতেই। আর সেই সুস্থিরতা অর্জনের গতিস্ক্রিয়তাই রাজনীতিকেও অস্থির করে তোলে। এই সময়ের গতিস্ক্রিয়তাতে সেই অস্থিরতার লক্ষণ রয়েছে।

এদেশে, সংগঠিত রাজনীতির চর্চা শুরু হয়েছে ঔপনিবেশিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে। ঔপনিবেশিকদের কাছ থেকে ক্ষমতা গ্রহণ করে দেশবাসীর হাতে সমর্পণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে। ক্ষমতার হস্তান্তরের প্রসঙ্গেই রচিত হয়েছে 'ওরা-আমরা' ঔপনিবেশিক ও দেশবাসীর পরিচয়— এই পরিচয় আবিষ্কারের মধ্যে দিয়েই জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ। জাতীয়তাবাদী রাজনীতির নিজস্ব যে কর্মসূচি তা ছিল দেশবাসীর ক্ষমতায়ন। দেশবাসী বলতে, ওই ঠেলাওয়ালা ও কোম্পানির মালিক দুইজনেরই ক্ষমতায়ন, যে যার মতো করে। ফলে ওই দুইজনেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সক্রিয় সদস্য হয়ে গিয়েছিল। দেশের স্বাধীনতার আন্দোলনের এই ইতিহাস আমাদের সব থেকে উজ্জ্বল ও মূল্যবান স্মৃতি— এই স্মৃতিই আমাদের বর্তমানকে চালিত করছে, এবং আমাদের ভবিষ্যতকেও। স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল দাবি ছিল, আমনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবি আর তার পরিপূরক হিসাবে এক সোনার ভারত গড়ে তোলার। ঔপনিবেশিকদের হাতে এই ভূখণ্ডের সোনার ভারত হয়ে ওঠার ভবিষ্যৎ লাঞ্ছিত, তাই স্বাধীনতার দাবি। পরিপূরক এই দাবিকে যুক্তিবদ্ধ করবার জন্য প্রাথমিক ভাবে দরকার এক সোনার ভারতের অবিষ্কার। সে ভারত কি কখনও ছিল? জাত-পাত, দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা তো এই দেশের ইতিহাসের সঙ্গেই স্থায়ী। শুধু এই দেশে কেন? এই ইতিহাস তো আর অন্য সব দেশের ইতিহাসেও স্থায়ী। সেই ইতিহাস থেকে বর্তমানকে এবং সেই সূত্রে ভবিষ্যৎকে বিচ্ছিন্ন করতেই দেশে দেশে যে জাগরণ হয়েছে তা অতীত স্মৃতিকে বর্তমানের যুক্তিতে সৃজন করার জন্যই। এই দেশেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। জাতীয়তাবাদ রাজনীতির সূচনাই হয়েছে সামাজিক সংস্কারের পটভূমিতে বা বলা যায় অতীতকে সৃজন করার ভাবনা থেকে উজ্জীবিত হয়ে ভবিষ্যতের ভারতের এক ধারণাকে বাস্তবায়িত করার জন্য। যে ভারত অতীতের সঙ্গে যুক্ত আবার ঠিক যুক্ত নয়ও— অতীত জীবনের অনেক বিষয়কেই বর্জন করে ভিন্ন ভারতের উদ্দেশ্যে।

দারিদ্র্য, জাতপাত, ধর্মীয় বিবাদ এদেশের অতীতের স্মৃতি নয়, বর্তমানও; নতুন ভারতের প্রস্তাব এই সমস্ত প্রসঙ্গগুলিকে বাদ দিয়েই, এবং অতীত গৌরবের সম্পদ, ধর্মীয় সদ্ভাব, জাতপাতের সংস্কার থেকে মুক্তির অতীত স্মৃতির সঙ্গে যুক্ত থেকেই। তবে বিষয়টা এমন সোজাসাপ্টা হলে ভালো হতো। দেশি সমাজ এই উজ্জীবনের প্রশ্নে শুরু থেকেই মতদ্বৈধতার মধ্যেই বাস করেছিল। ভবিষ্যৎকে অতীত থেকে সৃজন করার একটি মত যেমন সারা বিশ্ব থেকে উদ্দীপনা সংগ্রহ করছিল; তেমনই ভিন্ন একটি মতও এই দেশের অতীত থেকেই উদ্দীপনায় আগ্রহী ছিল, যে দেশি উদ্দীপনা ক্রমশ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। সোনার ভারতের ধারণা থেকে সেই দেশি উদ্দীপনা সংগ্রহের জন্য দরকার, অতীত ভারতের সেই স্বর্ণ যুগের উদ্দীপনাকে অবিষ্কার করা। ফলে একদল যখন মানবাধিকারের আধুনিক প্রস্তাবে আগ্রহী তখন অন্যদল শাসন/ধর্ম শাসিত অধিকারের দেশি তত্ত্ব আবিষ্কারে ব্যস্ত। এই নিয়েই বিতর্ক, অতীত কি সদর্থে চিরকাল স্বর্ণমণ্ডিত ছিল? অতীতকে কি সেই কল্পিত স্বর্ণমণ্ডিত মহিমায় বর্তমানের সময়ে আবাহন করা যায়? অতীতের কোন্ কোন্ স্মৃতিকে বর্তমান গ্রহণ করবে আর কোন্ কোন্ স্মৃতিকে বর্জন করবে তার বিতর্ক সতীদাহ সমর্থন/বিরোধিতাতেই স্পষ্ট। একপক্ষে ব্রাহ্মণ রাজা রামমোহন রায় অন্যপক্ষে অব্রাহ্মণ রাজা রাধাকান্ত দেব। রামমোহন রায় অতীতকে মানবাধিকারের নব্যন্যায়ের আলোকে সৃজন করতে উদ্যোগী; রাধাকান্ত দেব উদ্যোগী অতীতকে পুনর্জীবিত করতে। পুনর্জীবনের

বা সৃজনের বিতর্কে যে যুক্তি উদ্ধৃত তা ওই অতীত থেকেই, প্রাচীন পুঁথি থেকেই উদ্ধৃত। পার্থক্য শুধু ব্যাখ্যার। এর মধ্যে যে বিষয়টা অনুপস্থিত থেকে গেল, তা হলো ব্যাখ্যাকার কে? প্রাচীন শাস্ত্রকে ব্যাখ্যা করবার শাস্ত্রসম্মত অধিকার ব্রাহ্মণের, সেই অধিকার দাবি করে অব্রাহ্মণ শাস্ত্র ব্যাখ্যা করলে, তা অতীতের সুবর্ণ যুগকেই নব ব্যাখ্যায় সৃজিত করে। অথচ রাধাকান্ত দেব তাই করেছিলেন, তার রাজনৈতিক প্রয়োজনে। আর রামমোহনও সেটাই করেছিলেন তবে শাস্ত্র ব্যাখ্যার অধিকার থেকেই। অন্যদিকে, আবার রামমোহন ব্রাহ্ম ধর্মের উদ্‌গাতা। রাধাকান্তের পক্ষ থেকে সেটাও উল্লেখ ক'রে, ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মের থেকে পৃথক করে, শাস্ত্র ব্যাখ্যায় তাঁর অধিকার সম্বন্ধেই প্রশ্ন তুলেছিলেন। আর এই প্রশ্নের মধ্যেই রাধাকান্তের শাস্ত্রে অধিকার সম্বন্ধে একটা মান্যতা ছিল। সেই মান্যতা শুধু অব্রাহ্মণকে শাস্ত্র ব্যাখ্যার অধিকার দেয়নি, অতীতকে বর্তমানের প্রয়োজনে সৃজনও করেছিল। সমাজের বর্তমানকে, তার ভবিষ্যৎকে সৃজন করবার উদ্যোগ শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক---- সংগঠিত রাজনীতির। প্রয়োজন- ভেদে অতীতকে সৃজন করার ব্যাখ্যাও রাজনৈতিক।

রাজনৈতিক প্রয়োজনভেদেই এই বিভাজনের প্রধান কার্যকারণ। রামমোহন-পক্ষের সমাজ সংস্কারের উদ্যোগের মধ্যে রাধাকান্ত-পক্ষ যে সামাজিক কর্তৃত্বের বদলের ইঙ্গিত লক্ষ্য করেছিলেন তা রাজনৈতিক। রাজনীতির সেই যুক্তিতেই রাধাকান্ত ও রামমোহনের পক্ষের বির্তক। এই রাজনীতির যুক্তিই রাজা আর প্রজার মধ্যে বিতর্ক রচনা করে, ঠেলাওয়ালা আর কোম্পানির কর্তার মধ্যে বিবাদের ক্ষেত্র তৈরি করে। সামাজিক আধিপত্যের এই যুক্তি আবার আর্থিক আধিপত্যের সম্পর্ক দিয়েই যুক্তিযুক্ত। আর সেইটাই সার কথা। সামাজিক আধিপত্যের যুক্তির সঙ্গে আর্থিক আধিপত্যের যুক্তি যে ভাবে একে অন্যকে সরাসরি ব্যাখ্যা করে বা করে না, আড়াল করে রাখে, তেমন ভাবে ধর্মও তার গোঁড়ামি আড়াল করে বা ঢেকে রাখে সংস্কৃতিকে দিয়ে, তার গোঁড়ামিকে দিয়ে। আর সেই আড়ালের সুযোগে অতীত-সংস্কারকে আধুনিকতার বিচারে সমালোচনা করলে, সেই অতীত-সংস্কৃতি ধর্মকেই ঢাল হিসাবে তুলে ধরে। আবার ধর্মকে নতুন ভাবে সৃজন করবার যে কোনো আধুনিকতাই প্রতিহত হয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যের দাবি দিয়ে। রাধাকান্ত দেব এই বিতর্কে যে অন্তিম যুক্তি পেশ করেছিলেন তা হলো দেশি সংস্কৃতির ঐতিহ্যের যুক্তি, সতীদাহের ঐতিহ্যের যুক্তি। শোনা যায়, এই যুক্তিতে উদবুদ্ধ হয়ে কলকাতার কেন্দ্রীয় কারাগারের কয়েকজন গাঁটকাটা সরকার বাহাদুরের কাছে নিবেদন করেছিলেন যে, গাঁটকাটা তাদের ঐতিহ্যপূর্ণ সংস্কৃতি; এই সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য, বজায় রাখবার জন্য তাদের অবিলম্বে জেল থেকে রেহাই দেওয়া হোক। সংস্কৃতি, ধর্মের এই সহাবস্থান থেকে ধর্ম আর সংস্কৃতিকে আলাদা করতে গেলে সমগ্র সমাজের সহমত ও সৃজন উদ্ভাবন দরকার। সমালোচনাও দরকার, আর তার ঐতিহ্য তো এই দেশেই আছে— খাজা মইনুদ্দিন চিস্তির দরগায়, কবীর, তুকারামের দোঁহায়, লালন সাঁই, শাহ আব্দুল করিমের গানে অথচ সেই ঐতিহ্যের বৈপরীত্যেই ভ্যালেন্টাইন ডে-র বিপক্ষ যুক্তি, আর সে যুক্তি সংস্কৃতি রক্ষারই যুক্তি। একটু নখ দিয়ে ঘষলেই ধর্মীয় গোঁড়ামির রঙ বেরিয়ে পড়বে। যেমন বেরিয়ে পড়ে ব্রাহ্মধর্মকে আক্রমণ করতেই রাধাকান্ত দেবের হিন্দু পুনরুত্থানবাদী যুক্তির অবতারণা। আর তারই মধ্যেই রয়েছে সোনার ভারত সম্বন্ধে নির্মাণ, যা সমস্ত আধুনিকতাকে প্রতিস্থাপিত করতে পারে; আধুনিকতার যুক্তি এদেশ থেকেই সংগ্রহ করা যেতে পারে— যেমন শত্রুঘ্ন ব্রহ্মাস্ত্র বাণ নিউক্লিয়ার ফিশনের আধুনিকতাকে উপহাস করে অথবা ইন্দ্রের রথ আধুনিক এরোপ্লেনকে নিতান্ত অর্বাচীন প্রতিপন্ন করে। ব্রহ্মাস্ত্র বা ইন্দ্রের রথের বর্ণনার মধ্যেই স্বর্ণমণ্ডিত অতীতের একটা বর্ণনা রয়েছে, সেটা শুধু অতীত নয় সেই অতীতকে ফিরিয়ে আনার মধ্যেই আমাদের ভবিষ্যতের দাবি। ভবিষ্যতের সেই স্বর্ণময় ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করবে---- এই দাবিতেই পুনরুত্থানবাদী জাতীয়তাবাদের উত্থান। স্বীকার করতেই হবে, যে তীব্রতায় জাতীয়তাবাদের এই সংস্করণের উত্থান, তার বিপরীতে সংস্কারকামী জাতীয়তাবাদ অতীতকে সৃজন করায় কখনই সেই তীব্রতা অর্জন করতে পারেনি তার অন্তর্লীন দ্বিধার জন্যই। সমস্ত প্রাচীন সভ্যতাতেই এই রকমই হয়ে থাকে।

এই দ্বিধা বা তীব্রতা সবই সংগঠিত রাজনীতির ক্ষেত্রে ঘটেছে কারণ দেশবাসী সকলেই এই দ্বিধা বা তীব্রতার মধ্যেই বাস করে এসেছে। শুধুমাত্র সংস্কারকামী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেই যে দেশের স্বাধীনতা এসেছে এটা দাবি করলে বোধহয় সবটা বলা হয় না; এরই সঙ্গে ধর্ম ও অতীত স্বর্ণযুগ ফিরিয়ে আনার সংকল্পও সক্রিয় ছিল। যে স্বর্ণযুগের বর্ণনা বৈভবের ক্ষমতার বর্ণনা, দারিদ্র্য বা সামাজিক অসাম্যের অক্ষমতার বর্ণনা নয়। স্বাধীন ভারতের কল্পনায়, সেই বৈভবের ক্ষমতার বর্ণনাই ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্তির দাবিকে গতি দিয়েছিল।

দেশ ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্ত হয়েছে, স্বাধীন হয়েছে কিন্তু সংস্কার আর পুনরুত্থানের দ্বিধা ও তীব্রতার সেই অতীত স্মৃতি বজায় থেকেই গেছে। স্বাধীনতার অর্ধশতকের পরেও দেশের অর্থনীতি সেই অতীত স্মৃতিকেই বহন করেছে। প্রাথমিক উৎপাদনের পদ্ধতি ও সম্পর্কে বিশেষ কোনো বদল হয়নি; শিল্প-উৎপাদন এখনও শক্ত জমির সন্ধানে; বদল যা হয়েছে তা হলো রাজনীতির গতি ও মুখ। ঔপনিবেশিক দেশে যে অধিকারের দাবি তা ঔপনিবেশিক শাসন ক্ষমতার কাছেই ছিল, স্বাধীন দেশে সেই দাবিরই পরম্পরা, তবে তা দেশের রাষ্ট্রক্ষমতার কাছে অধিকারের প্রসঙ্গেই উঠে আসছে বিভিন্ন সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রসঙ্গ আর তার সমাধানে প্রয়োজন সামাজিক সম্পর্কের সংস্কার। এই দাবির সঙ্গে যথার্থ কারণেই যুক্ত রয়েছে আর্থিক অধিকারেরও প্রশ্ন। ফলে অর্ধ-শতাব্দীর পরে রাজীনতির উদ্দেশ্য বদলে গেছে। আর তার দাবিদারের পরিচিতিও। সামাজিক অথবা সংস্কারের দাবিতে আজ ঠেলাওয়ালা আর কোম্পানির কর্তা একত্র হতে পারবেন না, যেমন হয়েছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়— সে অতীত স্মৃতি মাত্র। কোম্পানির কর্তার দাবি থাকলেও ক্ষেত্র আলাদা আর পথে নেমে রাজনীতির দাবিদার ওই ঠেলাওয়ালা। ঔপনিবেশিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে যে জাতীয়তাবাদী রাজীনীতির উত্থান তা আজ স্মৃতিমাত্র, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ঠেলাওয়ালা আর কোম্পানির কর্তার পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়ানোর যে রাজনৈতিক তীব্রতা ও অস্থিরতার মুখ গড়ে উঠছে তার সুস্থিরতা দিতে পারে একমাত্র ওই অতীতের স্বর্ণযুগকে আবাহনের সংকল্প। যে সংকল্প কল্পিত-অতীত, বর্তমান অনুপস্থিত। স্বাধীনদেশের প্রথম কয়েক দশক সেই আবাহানের মহাযজ্ঞে নিয়োজিত হলেও, দেশি সমাজে তার প্রভাব যে তেমন পড়েনি তার একটা কারণ সংস্কারমুখী জাতীয়তাবাদের প্রতি আস্থা তবে সেই সংস্কার যে সমাজের ক্ষমতার কেন্দ্রগুলিকে বদলে দিয়েছিল

এমনটা তো নয়। আর্থ-সামাজিক সম্পর্কগুলিও যে বদলে গেছে তাও নয়।

এই মাত্র খবর এল, ভারত খাদ্যে ভর্তুকির ব্যবস্থার বিপক্ষে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) যে প্রস্তাব নিয়েছে তার বিরোধিতা করেছে। দেশের বামপন্থী রাজনীতি এতে খুশিই হবে কিন্তু এই বিরোধিতার মধ্যে এক আকাট সত্যও তো ঢাকা রয়ে গেল— স্বাধীনতার অর্ধ-শতাব্দীর পরেও দেশের অধিকাংশ মানুষ দু'বেলার অন্নের সংস্থানের আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জন করতে পারেনি, এখনও উচ্চ আয়ের নাগরিকদের করের অর্থে তাদের দু'বেলা অন্নের ব্যবস্থা হয়। বিষয়টাকে এই ভাবে দেখাটা একটু নির্দয় শোনালেও এইটাই তো সত্য আর এই সত্যের মধ্যেই ঢাকা রয়েছে ভূমি আর কর্মের সঙ্গে সাধারণ নাগরিকের সম্পর্কের প্রসঙ্গ, নাগরিক অধিকার আর সেই সূত্রে সামাজিক ন্যায়-বিচারের প্রশ্ন। বিগত দশকগুলিতে এমনই হয়ে এসেছে— নাগরিক অধিকার আর সামাজিক ন্যায়-বিচার দেশের আইন ব্যবস্থা আর কোর্ট-কাছারিতেই আজও আটকে রয়েছে। সামাজিক তথা আর্থিক স্বনির্ভরতা যে ক্ষমতা দেয় তা ভবিষ্যতের কল্পনাতেই রয়ে গেছে, আর এই কল্পনার বৃত্তান্তেই একালের রাজনীতির ঘূর্ণি।

অতীতকে বহন করেই দেশ অগ্রগতির পথে, পৃথিবীর অন্যতম ক্ষমতা হিসাবে উত্থিত হওয়ার স্বপ্নে বিভোর। এই স্বপ্নে, সংস্কারমুখী রাজনীতির চর্চার অবকাশ কম, কারণ তা আবার সুখস্বপ্নের সুস্থিরতাকে ব্যতিব্যস্ত করতে পারে। ফলে সোনার ভারত, স্বাধীন ভারতে দারিদ্র্য ও সামাজিক অক্ষমতার শর্তগুলি থেকেই গেল; তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে রকেট উৎক্ষেপণে সোনার ভারতের বর্ণনা থাকলেও, সেই ঠেলাওয়ালা ওই একই ফুটপাথে রাত্রি যাপন করে, জীবিকা অর্জনের অধিকার পুলিশের ইচ্ছার ওপরই নির্ভরশীল। এই এক রাজনৈতিক শর্ত যা জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক শাসন ক্ষমতাকে প্রশ্ন করতে পারে। করেছেও, স্বাধীন ভারতে ভূমিহীন কৃষক, বাস্তুহারা, বস্তিবাসীর অধিকারই ক্ষমতাসীন শাসকবর্গের রাজনীতিকে প্রশ্ন করার রাজনৈতিক কর্মসূচি। এই প্রশ্নেই, সংস্কারপন্থী জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক সংগঠনের ঐক্য ক্রমে আদর্শগত ও ব্যক্তিস্বার্থভেদে আলাদা আলাদা অস্তিত্ব অর্জন করেছে, ঠেলাওয়ালার দাবি আর কোম্পানির কর্তার দাবির মধ্যে ফারাক এসে গেছে। এই ফারাক থেকেই সংস্কারমুখী জাতীয়তাবাদ খণ্ডবিখণ্ড। এই খণ্ডিত রাজনৈতিক দলগুলির প্রস্তাব সামাজিক ন্যায় ও অধিকারের প্রশ্নেই দাবি তুলেছে। সেই সমবেত দাবি বাস্তব কারণেই পুনরুত্থানকামী জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক সংগঠনগুলিকে এককাট্টা করবার সুযোগ করে দিয়েছে। এই সব দাবিকে তাদের কোনো তাত্ত্বিক-স্তরে বিতর্ক হওয়ার কারণ নেই, কারণ তাদের যে সোনার ভারতের দাবি, তাতে দারিদ্র্য বা সামাজিক ন্যায় বা অধিকারের শর্তই নেই। সোনার ভারতের রামরাজ্যের সুস্থিরতায় সকলেরই নিজ নিজ ধর্ম রয়েছে, ঠেলাওয়ালা বা কোম্পানির মালিকের। যে যার জীবনযাপনে সেই ধর্ম পালন করে চলবে। ঠেলাওয়ালা, ঠেলাওয়ালার ধর্ম পালন করবে, কোম্পানির কর্তা, তার নিজের কর্মে নিষ্ঠ থেকেই ধর্ম পালন করবে। সবার ওপরে রয়েছেন রাজা, তিনিই দেখবেন সকলে তার নিজ নিজ ধর্ম পালন করছে কি না?

অন্যদিকে, সংস্কারমুখী জাতীয়তাবাদ বিভিন্ন কারণে খণ্ডিত হয়ে যতটা না সংস্কারের পথ ও গতিকে খণ্ডিত করেছে তার থেকে বেশি খণ্ডিত করছে সংস্কারের বিষয়গুলিকে সংগঠিত রাজনীতির আওতায় এনে। সামাজিক সংস্কারের গতি সমাজ থেকে উত্থিত হলেই যে তার তীব্রতা পায়, অন্যথায় সেই দায় সংগঠিত রাজনীতির আওতায় এলে শুধু যে বিতর্ক বাড়ে তাই নয়, সমাজের দায় কমে, সমাজ ও রাজনীতি একে অন্যের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। খাপ পঞ্চায়েতের বিচারপদ্ধতির সংস্কার যে প্রয়োজন, এই নিয়ে কোনো বিতর্কই হবে না কিন্তু এই দাবি সেই সমাজ থেকে না উঠলে এই ঐতিহ্যপূর্ণ সংস্কৃতির সংস্কার কি সম্ভব? খাপের অনুসরণে সেই সমাজ শুধু তার ক্ষমতার কাঠামোর বিন্যাসকে সংরক্ষিত করে না, সেই সমাজ এই সংস্কৃতিকে অনুমোদনও করে। সংস্কারমুখী জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক শাসন এই বিষয়ে সাংবিধানিক যুক্তির অবতারণা করে শেষ পর্যন্ত খাপ সমর্থকদেরই এককাট্টা করেছে। এই সংস্কারের জন্য সেই সমাজেরই জাগরণের দরকার। আশির দশকে শাহ বানু মামলার রায়ের সাপেক্ষে সাংবিধানিক পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়ায়, একটি মেয়ে জানিয়েছিল—সাংবিধানিক সংস্কারের চাইতে আমাদের মুসলমান সমাজে দরকার একজন রামমোহন রায়ের। প্রতিক্রিয়ার ইঙ্গিতটা বোধহয় এই যে সংগঠিত রাজনীতি বা সাংবিধানিক রাজনীতির চাইতে দরকার সামাজিক জাগরণ। এই জাগরণই এদেশের রাজনীতির উত্থানের পরিপ্রেক্ষিত। এই প্রেক্ষিতটিই স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে সক্রিয় ছিল, যে প্রেক্ষিত রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে সমাজের ক্ষেত্রকে পৃথক ভাবে বিচার করত। একালের রাজনীতি, সমাজের সংস্কারের একনিষ্ঠ হয়ে গোটা সমাজ ও তার দায়কে তাদের কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্র করে তুলেছে। আর তার প্রভাবে রাষ্ট্রনীতি ক্রমশ খর্বিত। পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সেই সমাজের মতামত যত না শোনা যায় তার থেকে বেশি শোনা যায় সংগঠিত রাজনৈতিক দলের মতামত, আইন প্রণয়নের হুমকি।

সতীদাহ কি শুধু আইন প্রণয়ন করে রোধ করা গিয়েছিল? আইন প্রণয়নের পরেও সতীদাহ ঘটেছে। আইন বিরোধিতাকে মান্যতা দিয়েছিল মাত্র— বিরুদ্ধতা গড়ে উঠেছিল সংস্কারকামী সমাজের থেকেই। কালো টাকার বিরুদ্ধে, গাড়িতে যথেষ্ট লাল আলো লাগানোর বিরুদ্ধে আইনের তো অভাব নেই? কিন্তু তাই বলে কি সে সব রোধ করা গেছে? সমাজ ও রাজনীতি, এই প্রসঙ্গে সমাজবিদেরা নিদান দিয়েছেন— সমাজ রাজনীতির বাইরে নয় ফলে সিভিল সমাজের ধারণা অবান্তর। সে নিদান শিরোধার্য, কিন্তু সমাজের নিজস্ব রাজনীতি থাকতেই পারে আর সে রাজনীতি যদি সংগঠিত রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ে তা হলে সে তো গৃহযুদ্ধেরই সামিল। সংগঠিত রাজনীতি, সামাজিক রাজনীতির সঙ্গে মিশে শুধু এই রাজ্যেই নয়, গোটা দেশেই গৃহযুদ্ধের জমি তৈরি করছে। এই আজই, মোরাদাবাদ, সাহারানপুরে সেই লড়াই-এর তাল ঠোকা শুরু হলো।

ম্যাক্স ওয়েবারেই আবার ফিরে আসা যাক। তাঁর মতে ঐতিহ্যপূর্ণ প্রাচীন সমাজ যখন রাষ্ট্রের সাংবাধানিক আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার আওতায় আসে তখনই পরস্পরের প্রতি একটা সংঘাতের সংলাপ রচিত হয়। এই সংঘাতের সংলাপ চলতেই থাকে যতক্ষণ না সেই প্রাচীন সমাজ, রাষ্ট্রের সাংবাধানিক-আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার অন্তর্গত হয়। স্বাধীন ভারত, ম্যাক্স ওয়েবারের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, সেই সংঘাত-সংলাপের মধ্যেই বাস করছে এখন। খাপ পঞ্চায়েতের আর দেশের সংবিধানের সংঘাত এই সংলাপেরই অংশ। এই সংলাপে সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠনই সক্রিয় ভাবে

নিয়োজিত। ম্যাক্স ওয়েবারীয় পর্যবেক্ষণের সম্প্রসারণে, এদেশের সংগঠিত-রাজনীতির এই নিয়োজনের মধ্যে একটি সত্য রয়েছে— সত্য সব সবময়েই কঠিন, নিরপেক্ষ। এই সমস্ত সংগঠিত-রাজনীতি ইতিমধ্যেই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। প্রাচীন সমাজের পুনরুত্থানকামী রাজনীতি দেশের সংস্কারমুখী সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন; সংস্কারমুখী রাজনীতি দেশের পুনরুত্থানকামী সমাজের থেকে বিচ্ছিন্ন। আবার রাজনীতির এই দুই পক্ষই শেষ পর্যন্ত আমলাতান্ত্রিক-সাংবিধানিক রাষ্ট্রব্যবস্থার আশ্রিত। ক্ষমতার কেন্দ্র রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি এই আস্থা অনেক ক্ষেত্রেই চিরায়ত এবং থাকবন্দি সমাজের গতিশীলতাকে উপেক্ষা করলেও সমস্যা তৈরি হয় যখন অসমান সমাজের সংলাপ রাজনীতির বিষয় হয়ে ওঠার দাবি করে, তখন সেটা বিরোধী রাজনীতির ভাষা হয়ে প্রাথমিক ভাবে শাসন ক্ষমতাকেই আক্রমণ করে। সমাজ, রাজনীতির এও এক সংঘাতের সংলাপ। সেই সংলাপ, বিরোধী দাবির আধিপত্যের ভাষা হয়ে শাসক রাজনীতির প্রতি-আক্রমণেরই অস্ত্রে পরিণত হয়। সেই আক্রমণের নিস্পত্তি শেষ পর্যন্ত ওই আমলাতান্ত্রিক সাংবিধানিক শর্তেই সম্পন্ন হয়। আজকের বিরোধীপক্ষ কাল শাসকপক্ষে পরিণত হলে বা না হলেও।

এই ভাবেই সামাজিক দাবিকে, আমলাতান্ত্রিক-সাংবিধানিক ব্যবস্থাপনার আওতায় নিয়ে আসার প্রকল্পে সমস্ত সংগঠিত-রাজনীতিই সক্রিয়। এই সক্রিয়তার বাইরে, যেটুকু সংঘাত-সংলাপের অবকাশ তা সামাজিক স্তরেই সংগঠিত হলেও, তা প্রকাশ পায় সংগঠিত রাজনীতির অংশ হিসেবেই। সামাজিক স্তরের এই অবকাশ কি ভাবে কখন কি কার্যকারণে আত্মপ্রকাশ করবে সেটা জানা না গেলেও তার গতিপ্রকৃতি দেখে মনে হয়— সমাজের সংঘাত-সংলাপ শেষ হয়নি, এবং সেই সংলাপ শুধু যে আমলাতান্ত্রিক সাংবিধানিকতার প্রতি উদ্দিষ্ট এমনও নয়, তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সমাজ ও তার ঐতিহ্যেরও সংস্কারের দাবি। এই দাবিকে রাষ্ট্রক্ষমতা তথা সংগঠিত-রাজনীতি স্বীকার করলে তাতে সামাজিক সংস্কারের গতি সমর্থন পাবে। অতীতের সোনার ভারতের বর্ণনার সঙ্গে এই সংস্কারের দাবি সব সময় সহমত নাও হতেই পারে এবং এই অসহমতের বয়ান থেকেই ভবিষ্যতের সোনার ভারতের একটা বর্ণনা পাওয়া যাবে।

পুনরুত্থানবাদী জাতীয়তাবাদের ভাষ্যে যে সমাজের বর্ণনা, যে রামরাজ্যের বয়ান তাতে থাকবন্দি সমাজের কোনো অংশেরই সমাজকে অতিক্রম করার সুযোগ নেই। সমাজে যিনি যে কর্মে যুক্ত সেই কর্ম সমাধা করাই তার 'ধর্ম'। রাজার ধর্ম— রাজধর্ম, প্রজার ধর্ম— প্রজাধর্ম, কর্মীর ধর্ম— কর্মীধর্ম। ধর্মের এই থাকবন্দিকরণের যুক্তিতেই সমাজের সংস্কৃতি সুস্থির। কেউ এই ধর্ম অতিক্রম করলে তা অ-ধর্ম। এই ঐতিহ্যের বয়ানেই রাজস্থানের আমলাতান্ত্রিক-সাংবিধানিক সরকার শ্রমিক আইনের প্রবর্তন করেছেন। এই আইন, সংঘাত-সংলাপের সম্ভাব্য ক্ষেত্র। এই সংলাপ, সুস্থির সমাজের ঐতিহ্যের ধারণাকে যে প্রশ্ন করবে তার পূর্বধ্বনি আগেও শোনা গেছে মালকানগিরির বনজীবীর ভাষ্যে।

মালকানগিরির ভাষ্য, শুধু আমলাতান্ত্রিক সাংবিধানিক রাষ্ট্রক্ষমতাকেই প্রশ্ন করেনি, সমাজের ঐতিহ্যপূর্ণ সুস্থিরতার সংস্কৃতির বৈধতাকেও প্রশ্নের সামনে এনেছে। প্রজা তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবি তুলেছে। আমলাতান্ত্রিক-সাংবিধানিক রাষ্ট্র যত প্রাচীন সমাজকে সুস্থিরতার আদলে আনতে চাইবে, ততই সংঘাত-সংলাপ থেকে উঠে আসবে এই সব দাবি। ঠেলাওয়ালার দাবিও এই অবকাশ থেকেই উত্থিত। তার প্রশ্নের জবাব পাওয়া না গেলেও কোম্পানির কর্তার দাবির উত্তর পাওয়া যাচ্ছে। স্বাধীনতা অর্জিত হলেও ক্ষমতার কাঠামোর তো বদল হয়নি সমাজে। অথচ এরই মধ্যে রয়েছে সোনার ভারত গড়ে তোলার দাবি। রাষ্ট্রীয় স্তরে সেই দাবি পূরণের জন্যেই আজকের রাজনীতির উদ্দেশ্য হলো---- ডেভেলপমেন্ট। ডেভেলপমেন্টের মিত্র আর শত্রু, এই নিয়েই রাজনৈতিক মত বিভাজিত। আন-ডেভলপমেন্ট ভারত ছাড়ো এই শ্লোগানের সামনে সমস্ত সমাজই শত্রু আর মিত্রে বিভক্ত। আর, এই জাদু শব্দের মধ্যেই নিহিত একালের রাজনীতি।

ডেভেলপমেন্টের জাদু হচ্ছে, আজ ধার কাল নগদ প্রাপ্তি— এই হলো ফাটকা বাজারের রীতি আর তার রমরমা, নতুন নাম সেনসেক্স ইত্যাদি। প্রতিদিনের খবরের কাগজে, টিভিতে সেনসেক্স পড়ে গেলেই গোটা দেশে শোকের ছায়া নেমে আসে। 'কালকের দিন আচ্ছা দিন', এই জাদুতেই ক্রমশ অতীত ভুলে মানুষ কালকের আচ্ছা দিনের প্রতীক্ষায়। ফাটকাবাজির প্রধান কৌশল হলো, সম্ভাবনাকে বিক্রি করা আর তার এক বিশদ জমি ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গেছে। বিজ্ঞাপনের জগত আজ আর কেবল ব্যাবসা নয়, শীতল নির্বিকার গবেষণারই ক্ষেত্র। এই গবেষণা থেকেই কি করে সাবান বিক্রি করতে হবে তার বিজ্ঞাপন যেমন তৈরি হয় তেমনই কি ভাবে নির্বাচন জিততে হবে তারও কৌশল স্থির হয়। নির্বাচনও ফাটকা, নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বিক্রির বাজার আর কতরকম তার কৃৎকৌশল।

সেনসেক্সমুখী ভারতীয়, ডেভেলপমেন্টের মায়ায় মুগ্ধ ভারত কালকের ফাটকায় বাজি রেখে নির্বাচনে নিজের মত দিয়েছে। ষাট বছরে যা হয়নি তা যে এই পাঁচ বছরে হবে এমন আহম্মক কেউই নয় বরং একটা ফাটকা খেলে দেখা যাক---- প্রতিশ্রুতির বেলুন তো কম বড়ো নয়, যদি লেগে যায়! যে রাজনৈতিক পক্ষ এই ফাটকায় সাফল্য পেল, তার অতীত পুনরুত্থানকামী দাবি নিয়েই পরিচিত। আর, তার সেই অতীতই এবার তার বিপক্ষে। যে ফাটকা, বিজয়ী সংগঠনকে সমর্থন করেছে সে সোনার ভারতের পক্ষে অবশ্যই কিন্তু তা অতীতেরই সংস্কারকামী। অতীত ভারতের সঙ্গে বর্তমান ভারতের যে সুস্পষ্ট ব্যবধান তা হলো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো। যতই নড়বড়ে বলে অভিযোগ করা হোক না কেন, গণতান্ত্রিক পরিসর থেকেই সমাজের সংস্কারকামী দাবির আত্মপ্রকাশের যে ঐতিহ্য এই স্বাধীনতা আন্দোলনের অতীত থেকেই গড়ে উঠেছে তা প্রাচীন পুঁথি থেকে উদ্ধৃত করে কি আর থামানো যাবে। সংস্কারের দাবি তো সমাজের ওই প্রাচীনতাকে প্রশ্ন করেই রচিত হচ্ছে। অতীতের স্মৃতি থেকে নিষ্ক্রান্ত হতেই তো ডেভেলপমেন্টের প্রতিশ্রুতিতে সমর্থন।

সমস্যা হচ্ছে, অতীত স্মৃতির পুনরুত্থানের দাবি থেকে সরে এলে এই রাজনীতির কর্মসূচিই বিভ্রান্তির মধ্যে পড়বে। আবার, সেই কর্মসূচির সংস্কারে মন দিলে, আবার সংস্কারমুখী রাজনীতির থেকে নিজের স্বাতন্ত্র্যই পড়বে সংকটে। সব মিলিয়ে, এ বড়ো সুখের সময় অবশ্যই নয় তবে বড়ো চিত্তাকর্ষক সময়। স্বাধীনতার পর থেকেই যে রাজনৈতিক সম্পাদ্যের সমাধান এখনও হয়নি, মনে হয় এই সেই সময় যখন সম্পাদ্যটা ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা হয়ে গেছে, নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার পরেই, এখন অপেক্ষা সমাধানের। সে সমাধান, আগামী পাঁচ বছরে না হলেও তার গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে সম্ভবত জানা যাবে। □

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : *দুর্বার ভাবনা*, আগস্ট ২০১৪।